ভবানীপুরের কথা

১৬ই এপ্রিল ২০২৫ বুধবার ঠাকুর শ্রীশ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজীর ১১৩তম জন্মমহোৎসব। আমাদের ভবানীপুর মঠ ও বিজ্ঞানানন্দ মিশনের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। সারা বছর মিশনে নানা কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি ঠাকুরের নিত্য সেবাই আমাদের প্রতিদিনের উৎসব। মিশন এর বাড়িতে ঢুকলেই এক আশ্চর্য শান্তির ঘেরাটোপের মধ্যে চলে যাই। কত সমস্যা, কত ক্লেশ জমা থাকে বুকের মধ্যে সে সব কোথায় মিলিয়ে যায়। এই অনুভূতি কোন একজনের নয় যারা নিত্য আসেন এখানে তাদের প্রত্যেকের এই একই অনুভূতি। এমন কি নতুন মানুষরা এসে বলে এখানে কি শান্তি।

এই জন্মমহোৎসবেই একমাত্র রসিদ কেটে চাঁদা তোলা হয়। দুর্গাপূজো, কালীপূজো, রটন্তী কালী পূজো ঠাকুর শ্রীশ্রী লেনিন রায়ের জন্মতিথি, তিরোধান তিথি, আরও অন্যান্য তিথি পালনেও কোন চাঁদা তোলা হয় না। শুনেছি যখন ঠাকুর শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজীর প্রথম জন্মোৎসব পালন করা হবে ঠিক হয় তখন ঠাকুর নিজেই সবার কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার কথা বলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উৎসবের খরচের জন্য সবার সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। সত্যিটা হলো মহাপুরুষের জন্মমহোৎসবে সবার অংশগ্রহণে তাঁদেরই মঙ্গল। যাঁরা চাঁদা চাইতে যান মানুষের কাছে তারা অনেকের তাচ্ছিল্য ভরা বাক্য শোনেন – শ্লেষের সাথে একটাকা পান। আবার মধুর ব্যবহারও কপালে জোটে। দুরকম বিপরীত ধর্মী ব্যবহারে নিজের অবস্থান এর দিকে নজর রাখতে হয়। অর্থাৎ খারাপ ব্যবহারে আমি ক্রোধ আর দুঃখে বেসামাল হচ্ছি কি না আবার ভালো ব্যবহারে উদ্বেল হচ্ছি কি না এটা দেখতে হবে। এই মানুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়াটি কে বলে মাধুকরী বৃত্তি। এটি একটি চিত্তশুদ্ধির পথ। আর অন্যদিকে যারা চাঁদা দিচ্ছে তারা তাদের অজান্তেই পূণ্যার্জন করছে। কথাটা হচ্ছে ভিক্ষা করা বৃত্তিটা কি সত্যিই সবসময় চিত্তশুদ্ধির পথ? কত জায়গায়-রাস্তায়, ফুটপাথে, ট্রেনে, স্টেশনে, মন্দিরে কত লোক ভিক্ষা চাইছেন। তাঁরা কি মাধুকরী বৃত্তি নিয়েছেন? যিনি নিজের জন্য ভিক্ষা চান না তাঁরাই মাধুকরী করেন। যাদের আমরা রাস্তাঘাটে সামান্য টাকা বা খাবার দিয়ে সাহায্য করি তারা তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভিক্ষা করে। শুধু ক্ষুধা নিবারণ নয় বিনা পরিশ্রমে অলস জীবন যাপন করে দিন কাটানো এদের পছন্দ। একটা কথা আমি বলেছি যারা নিজের জন্য ভিক্ষা চান না তারাই মাধুকরী করেন। এখানে প্রশ্ন আসে গেরুয়াধারী সাধু সন্ন্যাসীরাও নিজের শরীর বাঁচানোর জন্য ভিক্ষা করেন। আমরা অনেকেই তাচ্ছিল্যসহ বলে থাকি – পরিশ্রম করে না একটা গেরুয়া পরে ভিক্ষাবৃত্তি করে নিজের ক্ষিদে মেটায়। তারপর আরও আরও শ্লেষ বাক্য আমরা বলে থাকি। কথা হচ্ছে তাহলে এই সব গেরুয়াধারীকে কেন সাধারণ ভিক্ষাবৃত্তিধারীদের সাথে এক করবো না?

না এক করবো না। কারণ এই সব সাধু সন্ন্যাসী তাদের সাধন ভজন দিয়ে এই পৃথিবীর পরিমণ্ডল কে শুদ্ধ করেন যা আমাদের, সাধারণ মানুষদের বোধের অগম্য। তাই ঐ নিরুচ্চার মঙ্গলাচারণ কে আমরা বুঝতে না পেরে কটুভাষণ করে থাকি। যারা জগতের জন্য আকাশ বাতাস সমস্ত পরিমণ্ডল এর কম্পনাঙ্ক

কে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর করতে থাকেন তাদের দেহটা বাঁচানোর জন্য মাধুকরী বৃত্তি নিতেই হবে। এখানে ভেকধারী সাধুর কথা বলা হচ্ছে না।

পরিমণ্ডলের কম্পনাঙ্ক উল্লেখ করেছি তাই একটা কথা বলি আমাদের চারিপাশের আকাশ বাতাস যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর কম্পনাঙ্কে উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে সেটা আমরা কিন্তু টের পাই। একেবারেই বুঝতে পারি না তা কিন্তু নয়।

যেমন দুর্গাপূজোয় – হাজার হাজার মানুষ, ছেলে বুড়ো মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে যায় ভুল উচ্চারণে অঞ্জলি দিয়ে বেড়িয়ে পড়ে – নতুন সাজে নতুন খাবারের স্বাদ গ্রহণে উৎসবে মেতে ওঠে। প্রতিটি মণ্ডপেই পুরোহিত সহ দুচারজন থাকেন সবসময় – নিষ্ঠাভরে প্রতিটি মণ্ডপে যখন মন্ত্রোচ্চারণ হয় মাকে নিবেদন করা হয় অন্তরের আর্তি তখনই সমস্ত পরিমণ্ডল এর কম্পনাঙ্ক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয় আর আনন্দ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেই আনন্দ তো আমরা টের পাই। সম্পূর্ণ উৎসবটি আনন্দের ঘেরাটোপে ঢাকা থাকে। যার মানসিক স্তর যত উন্নত আনন্দও তার কাছে তত নিখাদ।

আরম্ভ করেছিলাম 'মাধুকরী' নিয়ে শেষ করি আনন্দ দিয়ে – আমাদের যা কিছু জপ, তপ ধ্যান উপাসনা নমাজ প্রেয়ার সবকিছুই ঐ আনন্দ কে লাভ করার জন্য। যে যে পথ দিয়েই আসি না কেন রাজপথে যে সবাই কে আসতে হবে যেতে হবে চিরন্তন সত্যের কাছে। যে যেমন ভাবে পারছি এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছি। শুধু ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা – ''ঠাকুর তুমি আমাকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দাও।''